মূলপাতা

মাদ্রাসায় ধর্ষন এবং ইনসাফের দাবি

Asif Adnan

July 8, 2019

5 MIN READ

প্রত্যেক সমাজের একটা বিশেষ দায়বদ্ধতা থাকে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক সহিংস অপরাধ ঘটে মোটামুটি সব সমাজেই। কিন্তু সমাজের নারী ও শিশুদের ঢালাওভাবে অনিরাপদ হয়ে পড়া নিঃসন্দেহে ইঙ্গিত দেয় নৈরাজ্য এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের সামাজিক বিপর্যয়ের। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা এমনিতেই ভয়াবহ। শুধু নারী-শিশু না, দেবালয়ের আশেপাশের কিছু মানুষ কিংবা পশু ছাড়া বাকি সবার জন্যেই এ ভূখণ্ড এখন ভয়ের এক জনপদ। জঙ্গলের নিয়মে চলা, হরেক রকমের অসুখে ভোগা ত্রাসের এ রাষ্ট্রে বেশ অনেকদিন ধরেই চলছে ধর্ষনের অসুস্থ উৎসব। কিন্তু ইসলামী শিক্ষার সাথে যুক্ত কেউ যখন একজন শিশুকে কিংবা ছাত্রীকে ধর্ষন করে, তখন সেটা অন্য দশটা ঘটনার মতো থাকে না। তখন সমস্যাটা হয় দাঁড়ায় আরো তীব্র, আরো স্পর্শকাতর। বিভিন্ন কারণে।

মাদ্রাসায় কিংবা হুজুরের কাছে অভিভাবকরা সন্তানকে পাঠায় বিশ্বাস করে। আমানত হিসেবে। একই কথা প্রযোজ্য স্কুল এবং স্কুল শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও। এমন বিশ্বাসের জায়গাগুলোতে যখন শিশুরা নির্যাতনের শিকার হয় তখন রাস্তায় ঘটা একটা অপুরটুনিস্টিক ধর্ষনের সাথে সেটাকে মেলানো যায় না। কাজ হিসেবে দুটোই ধর্ষন। কিন্তু সমাজের প্রতিক্রিয়া এবং মানুষের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের দিক থেকে দুটোর মধ্যে পার্থক্য অনেক। পাশাপাশি ইসলামকেন্দ্রিক যে কোন কাজের সাথে যুক্ত মানুষের কাছ থেকে যখন কোন অপরাধ প্রকাশ পায়, তখন সাধারণ মানুষ সেটাকে দেখে একটু ভিন্নভাবে। আর এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। তার ওপর আছে ইসলামী ধারাগুলোর বিরুদ্ধে, বিশেষ করে কওমি মাদ্রাসাগুলোর ব্যাপারে বাংলাদেশের সুশীল-প্রগতিশীল-শাহবাগীদের দীর্ঘদিনের বিদ্বেষ ও প্রোপাগ্যান্ডা। নিজেদের সহস্র কুকর্ম বেমালুম ভুলে গিয়ে তারা সুযোগ পেলেই হুজুরদের দোষ হাইটলাইট করার জন্য ওৎ পেতে থাকে, এটা জানা কথা।

কাজেই বিভিন্ন দিক থেকে এরকম ঘটনা ঘটা এবং সেগুলো ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়া, অন্য দশটা মৌসুমী ইস্যুর মতো না। এগুলো দাবি রাখে বিশেষভাবে গুরুত্ব পাবার। তবে এধরণের ব্যাপারগুলো নিয়ে সচেতন হবার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল ইনসাফ এবং আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল এর কাছে দায়বদ্ধতা। এ শিশুদের, এ ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা দেয়া আমাদের দায়িত্ব। 'আমরা' বলতে আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাগরিকদের বোঝাচ্ছি না, বলছি এ ভূখন্ডের মুসলিমদের কথা। সেক্যুলারদের এজেন্ডা, এনজিওদের নানা মুভ-মেন্ট বাংলাদেশে ইসলামপন্থীদের বর্তমান নাজুক অবস্থান, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নৈরাজ্য, সবকিছুর পরও বাস্তবতা হল আমরা এই শিশুদের কাছে দায়বদ্ধ। তাদের নিরাপত্তা দেয়া আমাদের দায়িত্ব। যখন একটা শিশু এভাবে নির্যাতিত হয় তখন সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করা, এ অপরাধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া আমাদের দায়িত্ব। যখন এধরণের অপরাধ হতে থাকে দীর্ঘদিন ধরে, তখন অসুখের চিকিৎসা করা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়।

বিভিন্ন বিষয়ে শক্ত মতপার্থক্যের পরও আমি বিশ্বাস করি ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমদের জন্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদ্রাসাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শত কমতি এবং আপোস সত্ত্বেও বাংলাদেশের মতো একটা ভূখন্ডে কওমি মাদ্রাসাগুলোর মাধ্যমে দ্বীনের যে খেদমত হয় সেটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। অক্সিজেনের উপস্থিতির ব্যাপারে আমরা তেমন একটা মাথা ঘামাই না, কেবল অনুপস্থিতির সময়েই মাথা ঘোরা শুরু হয়। কওমি মাদ্রাসাগুলোর গুরুত্বের ব্যাপারটাও আমার কাছে অনেকটা এমন মনে হয়। অভ্যস্ততার কারনে আমরা হয়তো তাঁদের এ ভূমিকাগুলোকে গুরুত্ব দেই না, কিন্তু এগুলোর অনুপস্থিতিতে কী হতে পারে সেটা নিয়ে একটু রিয়েলিস্টিকালি চিন্তা করলে হয়তো এ বাস্তবতা বোঝা সহজ হবে।

এটাও স্পষ্ট যে কওমি উলামায়ে কেরাম ও তালিবুল ইলমের অধিকাংশ, ভ্যাস্ট মেজরিটি শিশু ধর্ষন ও যৌন নিপীড়নের এ ঘটনাগুলো ঘৃণা করেন। এটা যে আজ আলাদা করে বলতে হচ্ছে, সেটাই অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। শিশুদের ওপর ঘটা এসব অপরাধের জন্য পুরো কওমি অঙ্গনকে দায়ী করা নিঃসন্দেহে ভুল। কিন্তু প্রতিপক্ষ ও সমালোচনাকারীরা আক্রমনের সুযোগ

পেয়ে যাবে, তাই ধারাবাহিকভাবে ঘটা এসব অপরাধ নিয়ে চুপ থাকা, এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ না নেয়াটা জায়েজ করা সম্ভব না। একজন দাড়ি-টুপিওয়ালা মানুষ ধর্ষন করলেই সব হুজুর ধর্ষক হয়ে যায় না। কিন্তু ধর্ষক মাদ্রাসার শিক্ষক কিংবা ছাত্র হবার কারণে যদি সব হুজুররা মিলে সে অপরাধ চাপা দেয়ার চেষ্টা করে, কিংবা উপযুক্ত শাস্তি এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা প্রতিরোধের জন্যে যথাযথ পদক্ষেপ না নেয় – তাহলে সেটা নিসন্দেহে অপরাধ।

সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের শুকরিয়া মাহফিলের পর রাজনীতির প্রশ্নে কওমি অঙ্গনের অবস্থান এবং গ্রহণযোগ্যতা সাধারণ মানুষের অধিকাংশের কাছে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি মনেপ্রাণে চাই একই ব্যাপারটা যেন নৈতিকতার ক্ষেত্রে না ঘটে। পশ্চিমে ক্যাথলিক চার্চের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা থেকে শিক্ষা নেয়া জরুরী। নৈতিকতার প্রশ্নে যদি সাধারণ মানুষের কাছে বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোর সাথে সম্পৃক্ত উলামায়ে কেরাম এবং তালিবুল ইলম গ্রহণযোগ্যতার সংকটে পড়ে যান, কিংবা এ জায়গটায় বড়সড় একটা প্রশ্নবোধক প্রশ্ন তৈরি হয়ে তাহলে মাসলাক-মাযহাব-মানহাজ নির্বিশেষে এটা বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের জন্য অত্যন্ত নেতিবাচক হবে। স্পর্শকাতর বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক হিসেবনিকেশ করতে হয়, এবং এটা জরুরী। এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু কোন বিষয় পাবলিক স্ফেয়ারে চলে আসার পর সেটাকে চেপে রাখার চেষ্টা কখনও কার্যকর হয় না, বরং ব্যাকফায়ার করে।

একটা শিশু ধর্ষন হবার পর ইসলামের স্বার্থে আমাদের চুপ থাকা উচিৎ - এধরণের যুক্তি সাধারণ মানুষ ফিতরাতি ভাবে এবং আক্বলিভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। এবং পারার কথাও না। কথা বললে প্রতিপক্ষ সুযোগ পাবে – এ চিন্তা করার সময়টা পাড় হয়ে গেছে। অলরেডি সবাই কথা বলছে। এখন চুপ করে থাকা কিংবা না দেখার ভান করা কিংবা অন্যরাও তো ধর্ষন করে – এধরণের যুক্তি দেয়া অনেকটা নিজের পায়ে কুড়াল মারার মতো। এ মূহুর্তে যা দরকার তা হল ন্যারেটিভটা নিয়ন্ত্রণ করা। স্পষ্টভাবে বক্তব্য দেয়া। একটা সমস্যা যে আছে, সেটা স্বীকার করা। আবাসিক মাদ্রাসাগুলোর ক্ষেত্রে এ ধরণের অপরাধ দমনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া, সংস্কার করা। রেটোরিকাল তর্ককিংবা সব জায়গাতেই ধর্ষন হচ্ছে, এধরণের আলাপ যদি যৌক্তিকও হয়, তবুও শেষপর্যন্ত তা আরো সুবিধে করে দেবে ইসলামবিদ্বেষীদের জন্য। পাবলিক রিলেইশানের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মেন্টালিটিটা বোঝা জরুরী। এবং এ মুহুর্তে সাধারণ মানুষের অনেকের কাছেই মনে হচ্ছে এধরণের জবাবগুলো হল দায় এড়ানোর চেষ্টা কেবল।

আমার ক্ষুদ্র বিচারবিবেচনা ও সীমিত পর্যবেক্ষনের আলোকে মনে হয়েছে, কওমি অঙ্গনের মূল সমস্যা সদিচ্ছার না। সমস্যা নেতৃত্ব, সংস্কার, আত্নসমালোচনা ও আত্মোনুসন্ধানের প্রশ্নে। যেকোন সমস্যার সমাধানের আগে সমস্যার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। গন্তব্যে পৌছতে হলে আগে শুরু করতে হয় যাত্রা। সমস্যা সবার থাকে, সব জায়গাতেই থাকে। পার্থক্য হয় ভুল স্বীকার ও সংশোধনের প্রশ্নে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যে সংস্কার প্রয়োজন, তাজদীদি কাজ প্রয়োজন এটা বোঝা, স্বীকার করা, উপলব্ধি করার মতো মানুষের দরকার। অন্ধ অনুসরণ আর মুখস্থ উত্তর আওড়ানো শত সহস্রকে দিয়ে ধ্বংসোন্মুখ দালানকোঠা টিকিয়ে রাখা যায় না।